# পরিচয়ের রাজনীতি গঠন ও বিকাশ

শমীক সরকার

১

আমাদের অন্ততঃ দুটি স্মৃতি আছে। একটা সক্রিয় স্মৃতি। অর্থাৎ, মনে থাকা। আরেকটা হল, নিষ্ক্রিয় স্মৃতি, যা মনে থেকে গেছে কিন্তু মনে যে থেকে গেছে সেটা মনে নেই। আমাদের দৈনন্দিন চলে নিষ্ক্রিয় স্মৃতির দৌলতে। কিন্তু যত গুরুত্ব পায় সক্রিয় স্মৃতি, নিষ্ক্রিয় স্মৃতিকে স্মৃতি বলে ধরাই হয় না। একথা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয় যে সক্রিয় স্মৃতি মানুষের চিরকেলে ব্যাপার নয়। সেপিয়েন্স মানেই যে সক্রিয় স্মৃতির আধার—একথা বলারও কোনও কারণ নেই। এখানে একটা প্রশ্ন আসবে, তাহলে সেপিয়েন্সেরও আগের গুহামানুষের গুহাচিত্রগুলি? সেগুলি কেন আঁকা হয়েছিল? কেবল শখ-এ বা বোর হয়ে যাচ্ছিল সময় কাটছিল না তাই জন্য, নাকি কোনও উদ্দেশ্য ছিল? ওগুলো আঁকার কারণ যা-ই হোক, ওগুলো যে ওই সব গুহামানুষদের প্রজন্মান্তরে নিষ্ক্রিয় স্মৃতি হিসেবে ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। নতুন বাচ্চা যখন হয়েছে, বড়ো হচ্ছে, বাপ মা খালা জেঠাদের সঙ্গে এধার ওধার ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে এইসব গুহাচিত্রগুলো দেখছে আর গুরুজনদের জিজ্ঞেস করছে, এটা কী? ওটা কী? এটা কেন? ওটা কেন? এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বাপ মা খালা জেঠা তাদের গুরুজনরা যা যা বলেছিল এগুলো সম্পর্কে সেগুলোর যা মনে এল এবং আরো কিছু নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে 'বলছে'। এইভাবে চলছে আর কী! যতদিন না এই গুহামানুষদের যাপনগত সূতো ছিঁড়ে গেল—ততদিন অবধি এই গুহাচিত্রগুলি নিষ্ক্রিয় স্মৃতি। চলতে ফিরতে চোখে পড়ে। আলাদা করে কিছু মনে হয় না বা মনে রাখার ব্যাপার নেই। কিন্তু মনের (এবং/তাই শরীরেরও) গঠন হয় এগুলো দিয়ে, যেহেতু চোখে পড়ে। তাই মনে থেকে যায়।

এবার অনেক অনেক বছর যুগ শতাব্দী সহস্রাব্দ মহাযুগ পেরিয়ে এই গুহাচিত্রগুলি আবিষ্কার করল আরেকদল মানুষ। এবং সেই মানুষের জ্ঞানগম্যি ততদিনে এতটাই হয়েছে যে সে এগুলো কতদিন আগের জিনিস তা বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারছে, এগুলো অমুক যুগের জিনিস; তখন এই ধরনের মানুষেরা

থাকত। এবং সে একটা গল্প বানাবে। সেই গল্পে মিশে থাকবে তার কল্পনা, যা নিশ্চিতভাবেই তার যাপন থেকে পাওয়া ভাবনা চিন্তাগুলো দিয়ে রঙিন। সে যদি সেই গুহাচিত্রে দেখে, একটি মেয়ে একটি চিৎ হয়ে শোয়া ছেলের কোমরের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসে আছে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে, তাহলে সে গল্প বুনবে, সেই সময় যৌনতা শুধু ছেলেদের অ্যামিউজমেন্টের ব্যাপার ছিল না, মেয়েদেরও ছিল, বা, শুধু মেয়েদের অ্যামিউজমেন্টেরই ব্যাপার ছিল যৌনতা। কারণ তখন সমকালীন যাপনে ও চিন্তাভাবনায় স্বাধীন স্বাবলম্বী মেয়েরা যৌনতায় বিষয়ী হতে চাইছে, সমকালীন সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন ঘটছে এবং ইতিহাসে মেয়েদের বিষয়ীত্বর ঘটনাবলী খোঁজা হচ্ছে 'বিস্মৃতি'-কে পরাস্ত করে। প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি-র গঠনে এইসব সম্ভাবনার কথা হয়ত আসবেই না, যে, হয়ত প্রাগৈতিহাসিক গুহামানুষদের যাপনে যৌনতা আলাদা কোনও ব্যাপারই ছিল না প্রাত্যাহিক অন্যান্য কর্মের চেয়ে, বা ছবিটা হয়ত যৌনতার নয়ই, হয়ত শোকপ্রকাশের, ইত্যাদি প্রভৃতি।

সক্রিয় স্মৃতি সবসময়ই গঠন। যার বা যাদের সক্রিয় স্মৃতি, তাদের দ্বারা গঠিত। ব্যক্তিগত হলে তা স্মৃতি। কৌম হলে তা ইতিহাস। ব্যক্তিগত সক্রিয় স্মৃতিও গঠন। একই ঘটনা, সক্রিয় স্মৃতি হিসেবে তিরিশ বছর বয়সে যখন মনে করা হয়, তার গড়ন একরকম থাকে, চল্লিশ বছর বয়সে যখন মনে করা হয় তখন তার গড়ন আরেকরকম হয়, পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন মনে করা হয় তখন তার গড়ন আরও অন্যরকম ... তা যখন হাতবদল হয় অন্যদের কাছে, তখন সেই ভিন্নতাগুলি নিয়েই হয়। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ সবসময়ই নতুন ঘটনার বিবরণ। ওরাল হিস্টোরিয়ানরা হয়ত এই নতুনত্ব-কে অবহেলা করতে বলবেন, বা খুব বেশি হলে বলবেন, ঘটনার নতুন বিবরণ। কিন্তু মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষকরা বলবেন, নতুন ঘটনা, নতুন বিবরণ নয়। স্মৃতিচারণ সবসময়ই নতুন ঘটনা, তা সে বর্ণনা করা হোক বা না হোক। এবং সক্রিয় স্মৃতি ইনভোকেবল। আহ্বানযোগ্য। কৌমের সক্রিয় স্মৃতি সুরক্ষারও বিষয়। কারণ তো বলাই আছে, যে জাতির ইতিহাস নেই, সে জাতিই নেই। শুধু লাইব্রেরি, বইপত্তর ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখতে হবে তা-ই নয়, সেগুলি অসংশোধিত বা মূল রাখতে হবে তা-ই নয়, ভুলে টুলে গেলেও চলবে না। বিস্মৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর ডাক বিগত শতাব্দীতে যতবার যতদিক থেকে উচ্চারিত হয়েছে, তা বোধকরি আর কখনও কোথাও হয়নি। কিন্তু যেটা বলা নেই সেটা হল—এই স্মৃতি সবসময়ই সমসাময়িকের নির্মাণ। যেমন, বাবরি মসজিদের তলায় 'রামমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া'। স্মৃতির নির্মাণ পরিচয় গঠনের সবচেয়ে বড়ো স্তম্ভ।

## ২

গঠন বলতে সাধারণতঃ কোনও বস্তুর তৈরির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কারণ, বস্তুই

হল অস্তিত্ব। বস্তু বলতে শুধু জড় বস্তু নয়, জীবন্ত বস্তুও পড়বে। কিন্তু কোনও প্রক্রিয়াকে কি অস্তিত্ব ধরা যায়? যদি প্রক্রিয়াকে অস্তিত্ব ধরতে হয়, তাহলে অস্তিত্বকে বলতে হয় গতিশীল। এইখানে একটা সমস্যা হয়। অস্তিত্ব যদি গতিশীল হয়, তাহলে অস্তিত্ববিদ্যা তৈরি করা মুশকিল। প্রক্রিয়া নিজেই যদি অস্তিত্ব হয়, তার বিদ্যাও একটা গতিশীল ব্যাপার হবে। সেই কারণে তাকে বলতে হয় অস্তিত্বজনন। প্রক্রিয়ার গঠন। এছাড়া প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক অস্তিত্ব ধরলে প্রক্রিয়ার চোখ দিয়ে বস্তুকে দেখতে হয়। তখন বস্তু আর স্থায়ী কিছু থাকে না, হয়ে যায় একটা অন্তর্বর্তী অস্তিত্ব। অর্থাৎ, বস্তু হয়ে যায় প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দশা। যে দশায় প্রক্রিয়াটি একটি অস্থায়ী মূর্ত রূপ পায়।

সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া চলে, তার নাম ব্যক্তিকরণ—আর তাতে যে অস্থায়ী মূর্ত রূপটি তৈরি হয় সে-ই হল ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি একটি নয়, বরং অন্ততঃ তিনধরনের ব্যক্তিকরণ চলে। একটি জৈবিক। তাতে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন্ত হয় বা ঝিমিয়ে পড়ে। তবে মানুষ শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হয় না। যদি মানুষ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাহলে এমনকি নতুন নিউরন-ও জন্মায়। অর্থাৎ, মানুষ জৈবিক ভাবে বদলে বদলে যেতে থাকে। আরেকটি হল সামাজিক। তাতে ব্যক্তির পরিপার্শ্ব এবং ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের বদলের কারণে ব্যক্তি সামাজিকভাবে বদলে বদলে যেতে থাকে। অত্যন্ত সাধারণ উদাহরন হল, এই যে ছিল ছেলে বা মেয়ে, সেই ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে হয়ে উঠল বাবা বা মা। বা, ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি হয়ে উঠল হিন্দু। ইত্যাদি। আরেকটি হল মনোজাগতিক বা সাইকিক। ভয় পেলে, দুঃখ পেলে বা উদ্বিগ্ন হলে, মৃত্যুর মুখোমুখি হলে ইত্যাদি। মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণে মানুষ যেমন ব্যক্তিগত হয় (মানে 'আমি' হয়), তেমন আবার নিজেকে হারিয়েও ফেলে। এই তিন ব্যক্তিকরণ স্বাভাবিকভাবেই একসঙ্গে চলে এবং এর মধ্যে দিয়েই মানুষের সামগ্রিক অস্থায়ী মূর্ত রূপটি বা ব্যক্তি রূপটি প্রতিভাত হয়, যা বলাই বাহুল্য, ক্রমপরিবর্তনশীল। এই তিন যুগপৎ ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়া একে অন্যের মধ্যেও ঢুকে পড়ে; গতিশীল প্রক্রিয়ার চোখে দেখলে একটা গতিশীলতা থেকে বেরিয়ে আরেকটার মধ্যে ঢুকে পড়া। এই একটা গতি থেকে বেরিয়ে আরেকটা গতি-র মধ্যে ঢুকে পড়াকে অভিসারি বলা যায় না (অর্থাৎ, অদূর ভবিষ্যতে মিলবে), অপসারি বলা যায় না (অর্থাৎ, অদূর ভবিষ্যতে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে), বলা যায় আড়প্রসারি (সমান্তরাল আরেকটি গতিতে চলে যাওয়া)। ব্যক্তিকরণ এই আড়প্রসারি গতির প্রক্রিয়া। আড়প্রসার মানে একই সঙ্গে বদল এবং নতুন মূর্তায়ন। এখানেই শেষ নয়। এই বদলের প্রভাব পড়ে পরিপার্শ্বেও। জৈবিক, সামাজিক এবং মনোজাগতিক পরিপার্শ্বে। এমনিতেই কৌমেও চলে ব্যক্তিকরণ, কারণ প্রক্রিয়াটা গতির সাধারণ দশা—সব জায়গায় প্রযোজ্য—অস্তিত্ব। কৌমের ব্যক্তিকরণে গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী

নামক অস্থায়ী মূর্ত রূপ দেখা যায়।...

অস্তিত্ববিদ্যা বা অন্টোলজি নয়, অস্তিত্বজনন বা অন্টোজেনেসিসের দৃষ্টিকোণ হল আমাদের এই প্রবন্ধে পরিচয়ের গঠনকে সমালোচনা করার চোখ।

৩

সমস্যাটা শুরু হয়, যখন প্রক্রিয়ার বদলে বস্তুকে মূল অস্তিত্ব বলে ধরা হয়। তখন দেখাশোনায় বস্তুর দৃষ্টি ছেয়ে থাকে। আমাদের এতাবৎকালের সমস্ত জ্ঞান মূলতঃ এই বস্তুর দৃষ্টিতে দেখা। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে, স্থিতির দৃষ্টিতে দেখা, গতির দৃষ্টিতে নয়। জ্ঞানের গঠনকে অনেকসময় মানুষের বাস্তব উপলব্ধিগুলির চেয়ে অনেক আলাদা করে দেখা হয়। কিন্তু আদতে তা নয়। মানুষের বাস্তব উপলব্ধি এবং পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান—দুটিই আদতে একই। জাগতিক জ্ঞান। এমপিরিক্যাল নলেজ। কিন্তু সাধারণভাবে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানই জ্ঞানের তোষাখানায় জায়গা পায়। মানুষের বাস্তব উপলব্ধির মধ্যে নানা অলীক বা ভার্চুয়াল ঢুকে থাকে। তাছাড়া জ্ঞানের তোষাখানায় কোনও জ্ঞানের স্থান পেতে গেলে তাকে পরিমাপের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়, যা মানুষের বাস্তব উপলব্ধি থেকে হওয়া জ্ঞানের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া, মানুষের বাস্তব উপলব্ধিতে থেকে যায় ওই মানুষের তৎকালীন অবস্থার ঝোঁক বা ইংরেজিতে যাকে বলে বায়াস। তা হয়ে যায় ব্যক্তিক জ্ঞান। নৈর্ব্যক্তিক হয় না। নৈর্ব্যক্তিকতার জন্য প্রয়োজন হয় পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণলব্ধতা। অর্থাৎ, এমন এক পর্যবেক্ষণ, যা ঠিক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নয়; যা বহু-ব্যক্তির অভিজ্ঞতাতেও একই থাকবে। এবার আসা যাক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। একথা ঠিক যে জ্ঞানের তোষাখানা সতত পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্থির কিছু নয়, তা সবসময় পুনঃপরীক্ষার মধ্যে পড়তে পারে। কিন্তু বাস্তবতঃ নানা পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে যদি একটা জ্ঞান একবার তোষাখানায় ঠাঁই পেয়ে যায়, তাহলে সে প্রায় নট-নড়নচড়ন। তাকে অত সহজে স্থানচ্যুত করা যায় না। তাকে প্রশ্ন না করেই, অর্থাৎ তাকে প্রাকজ্ঞান ধরে নিয়ে পরবর্তীকালে সেই জ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়। একইভাবে মানুষের বাস্তব উপলব্ধিও মোটামুটি নট নড়নচড়ন। ফলে প্রবাহী-দৃষ্টির বদলে স্থির-দৃষ্টি আমাদের বাস্তব উপলব্ধিগুলিকে তৈরি করে এবং জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব উপলব্ধিগুলির আদলগত ফারাক না থাকায় আমাদের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি প্রায় আনচ্যালেঞ্জড ভাবে স্থির-দৃষ্টি প্রসূত। পরিচয়ের গঠনে এই স্থির-দৃষ্টির ভূমিকা নির্ধারক। মানুষের যাপনপ্রবাহে পরিচয় আঁকড়ে ধরে থাকার কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু স্মৃতির নির্মাণ থেকে শুরু করে বয়ানের নির্মাণ—সবেতেই পরিচয় পূর্বনির্ধারিত, স্থির। যে মা ছেলে বা মেয়ে মানুষ করছে, প্রাত্যাহিক জীবনে সে ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে যদি যথেষ্ট মেলামেশা করে তাহলে

সেখানে তার মা পরিচয় অত আর জোরালো থাকে না। কিন্তু তাকে বয়ান লিখতে বা বলতে দাও, দেখবে হাজার বার নিজেকে 'মা' বলছে।

গতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে বস্তুই কেবলমাত্র মূর্ত, ফলে তাকেই অস্তিত্ব বলে ভুল হয়, তা সে যতই অন্তর্বর্তী দশা হোক না কেন। চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা যদি এই ভুল করে চলতে পারেন শতকের পর শতক ধরে, তাহলে সেই বস্তু অস্তিত্ব থেকেই যে দেখছে, একজন মানুষ, তার আর দোষ কী। অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেকে দেখে তখন সে তার মূর্ত প্রকাশেই নিজেকে দেখে, এবং শুধু সেটা দেখেই না, সেটাকেই অস্তিত্ব বলে ভুল করে। এবার, মানুষ কীভাবে নিজেকে দেখে। হ্যাঁ, মানুষ এমনিতে নিজেকে দেখতে পারে না। অন্যকে দেখে এবং অন্যকে দেখার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে দেখে, তার সঙ্গে মিলিয়ে। আয়না দিয়ে সে যখন নিজেকে দেখে, তখনও সে অন্যকেই দেখে এবং নিজেকে তার সঙ্গে মেলায়। সে যখন নিজের কথা ভাবে, তখন তার এই সব দেখাটেখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার সঙ্গেই আরেকটা জিনিসও থাকে, সে যখন নিজেকে ভাবে, তখন সে নিজেকে অন্য কেউ বলে ধরে নিয়ে তার পর নিজের কথা ভাবে। এইসব থেকে তৈরি হয় তার মতামত ও সিদ্ধান্ত। এই নিজে মানে শুধু ব্যক্তি নয়। যে কোনও মূর্ততাই এই নিজের জায়গা নিতে পারে। অর্থাৎ, একটা পরিবারের একজন যখন নিজেকে ভাবে, তখন সে নিজেকে পরিবারের একজন হিসেবে ভাবে। এটাকে বলা যেতে পারে পরিবারের নিজেকে ভাবা, যা পরিবারের ওই ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে আকার পাচ্ছে। পরিবারের পুরুষ-কর্তা যখন নিজেকে নিয়ে ভাবে তখন সে পরিবারের বাকি সবার কথা ভাবে। মা যখন নিজের কথা ভাবে তখন সে কিছুতেই তার বাচ্চার থেকে আলাদা করে নিজেকে ভাবতে পারে না। পেশাদার মনোবিদ-রা যতই পরামর্শ দিক, শুধু নিজের কথা ভাবতে, কিছুতেই মানুষ শুধু নিজের কথা ভেবে উঠতে পারে না। এই শুধু নিজের কথা ভেবে উঠতে না পারার মধ্যে আছে যেমন সামাজিক ব্যক্তিকরণ, তেমনি আছে মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ। শুধু সামাজিক ব্যক্তিকরণ ব্যক্তি মানুষকে সমাজ থেকে আলাদা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদের মূর্ত যে ব্যক্তি প্রকাশ, তা-কে ব্যাখ্যা করা যায় না। অপরদিকে, শুধু মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ ব্যক্তিকে তার পরিপার্শ্ব থেকে আলাদা করে ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে দেখায়, তাই তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে না। শুধু সামাজিক বা শুধু মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ মানুষের বাস্তব বিচলনগুলি, প্রক্রিয়ার গতিশীলতায় তার এদিক ওদিক সেদিক চলাচলগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে যদি মনোসামাজিক ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা যায়, তাহলে অবশ্যই তার বিচলনগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পরিচয় হল মনোসামাজিক একটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার অস্থায়ী মূর্ত দশা।

মানুষের প্রাথমিক পরিচয় হয় তার ভাষা দিয়ে, গায়ের রঙ দিয়ে, লিঙ্গ দিয়ে, ধর্ম

দিয়ে, জাতিবৈশিষ্ট্য দিয়ে, জাতবৈশিষ্ট্য দিয়ে ...। এগুলো প্রাথমিক হলেও সব নয়। মানুষ আরো নানাভাবে পরিচয় গঠন করতে করতে যায়। ফুটবলার, সাইক্লিস্ট, গায়ক, কবি, বামপন্থী, শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি পরিচয়গুলি সারাক্ষণ তৈরি হয়। পরিচয় গঠন মানুষের আজীবন বৈশিষ্ট্য। পরিচয় গঠনের মধ্যে দিয়ে রক্তমাংসের আড়ব্যক্তি মানুষ (সহজ করে বললে, সামাজিক ব্যক্তি মানুষ) ঘটনাপ্রবাহে নিজের বিষয়ীত্ব বজায় রাখে। একটা ভালো উদাহরন পাওয়া যাবে অপ্রচলিত পত্রিকার ২০২৪ বইমেলা সংখ্যায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধে, যেখানে হুগলির শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক মহল্লাগুলিতে ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক দাঙ্গা এড়াতে বা রুখে দিতে লেখক 'শ্রমিক'পরিচয়কে আহ্বান করেন। পরিচয় গঠন একইসঙ্গে নিজের এবং অন্যের। যদি নিজের এবং অন্যের নির্মিত পরিচয় না মেলে তখন ব্যক্তির অস্বস্তি হয়। সে নানাভাবে এই মিলন যাতে হয় তার চেষ্টা করে। পরিচয়ের গঠন যে মনোসামাজিক একটি প্রক্রিয়া—তা এটা দিয়েও বোঝা যায়। সামাজিক যদি শুধু হত, তাহলে মানুষ লোকে তাকে যেভাবে দেখে তাতেই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু তা হয় না। তার নিজের নিজেকে দেখার সঙ্গে অন্যের দেখা-কে মিলতে হয়। এই না-মেলা —এই ফাঁক—পরিচয়ের রাজনীতিতে এই ফাঁকের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা পরে এই নিয়ে আলোচনায় আসছি।

যেগুলোকে প্রাথমিক পরিচয় বলা হলো সেগুলো প্রাথমিক, কারণ, ধরে নেওয়া হয়, সেগুলোতে ব্যক্তির কোনও নিজস্ব ভূমিকা নেই। তা সম্পূর্ণভাবে তার জন্মনির্ধারিত। অর্থাৎ জাত। ভাষার ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি, কারণ ভাষা মানে হল মাতৃভাষা। যদিও এর মধ্যে লিঙ্গ, গায়ের রঙ বা শরীরের অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো জাতিবৈশিষ্ট্য-র মধ্যে পড়ে—সেগুলোকে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়, এবং এই ক্ষেত্রে শুধু সামাজিক এবং মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ নয়, জৈবিক ব্যক্তিকরণও অস্তিত্বের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু যেহেতু একবার জন্মে গেলে এই জৈবিক ব্যক্তিকরণের কোনও বদল হয় না (রূপান্তরকামীতা কে আমরা আপাততঃ আলোচনার মধ্যে থেকে বাদ রাখছি), তাই এই জৈবিক ব্যক্তিকরণ আমাদের পরিচয়ের রাজনীতির গঠনের আলোচনায় আসবে না। যেটুকু আসবে সেটুকু হল, এই জৈবিক ব্যক্তিকরণজনিত যে সামাজিক ও মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণগুলি ব্যক্তির জীবনপরিসরে ঘটে চলে। মানুষের প্রাথমিক পরিচয়গুলি মানুষের আবেগের সবচেয়ে বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে—কারণ তার ছোটোবেলা কাটে এই পরিচয়গুলির গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে। ফলে এই পরিচয়গুলি তার সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তে গঠিত হওয়া। একইসঙ্গে ছোটোবেলা যেহেতু মানুষের মন ও চেতনার আদল গঠন করে নিষ্ক্রিয় স্মৃতির মাধ্যমে, তাই আবেগের গঠনে অঙ্গাঙ্গীভাবে লেগে থাকে এগুলো। একইসঙ্গে আবেগ এবং ঘটনাপ্রবাহে নিজের (বা নিজেদের) বিষয়ীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা পরিচয়কে (আরও ভালোভাবে বললে

আত্মপরিচয়কে) সমাজ-রাজনীতির অঙ্গনে এক অনন্য অক্ষ হিসেবে স্থাপন করে।

ফলিত বা চলতি পরিচয়ের রাজনীতি অবশ্য কোনও একটা পরিচয়কে মূল বলে ধরে নেয় এবং বাকিগুলোকে গৌণ পরিচয় বলে মনে করে। অর্থাৎ, কোনও একটা সময় ও পরিসরে সেখানকার কিছু মানুষকে বিষয়ী হিসেবে স্থাপন করার চেষ্টা করে। পরিচয়ের রাজনীতির আংশিকতার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে প্রাক-বিশ্বায়ন পরিচয়ের রাজনীতির বাস্তুতন্ত্র থেকে। যেমন, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু ভাষাসাপেক্ষ। যদিও ওই পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষ না থাকারও অনেক উপাদান ছিল। কিন্তু পরিচয়ের রাজনীতির এই আংশিকতাই তাকে ধারালো হাতিয়ার দেয়, যা সমসাময়িক বাস্তবতাকে আন্দোলিত করতে পারে এবং বদলাতে পারে (উদাহরন—তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি স্লোগান)। রাষ্ট্রীয় রাজনীতিগুলির সর্বমঙ্গলময়তার বিপরীতে পরিচয়ের রাজনীতির আংশিকতা তাকে মানুষের মনোজাগতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করতে দেয়—বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ঘৃণা। আদর্শভিত্তিক রাজনীতি তার সামগ্রিকতার কারণে এইগুলি ব্যবহার করতে পারে না। পরিচয়ের রাজনীতি সকলকে নিয়ে চলতে বলে না। অন্যান্য রাজনীতিগুলি অবশ্য পরিচয়ের রাজনীতির এই ধারালো ব্যাপারটা বোঝে এবং মাঝেমাঝে ব্যবহার করে। এমনকি বামপন্থী আদর্শভিত্তিক রাজনীতিও 'শ্রমিক' আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে আন্দোলন করে সাড়া ফেলতে পেরেছিল, আশি-নব্বই-এর দশকের কলকাতা ও তার আশেপাশের শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে এর অনেক উদাহরন পাওয়া যায়। তবে পরিচয়ের রাজনীতি যতই চেষ্টা করুক নিজের রাজনীতির পরিচয়-অক্ষটিকে মুখ্য বলে দেখাতে—বাস্তবে রক্তমাংসের মানুষ তার সমস্ত পরিচয়কে নিয়েই বাঁচে এবং ঘটনাপ্রবাহে বিষয়ী হবার প্রয়াসে যখন যেটা দরকার তখন সেটা ব্যবহার করে।

পরিচয়ের রাজনীতি একটি পরিচয়কেই মুখ্য হিসেবে দেখালেও এই প্রাথমিক পরিচয়গুলির কোনওটিই একটি অন্যটির থেকে দৃঢ়তর নয়। কারণ, এগুলি প্রতিটিই একইরকম সামাজিক ও মনোজাগতিক ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী প্রকাশ্য দশা। ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, জাতি ও জাতবৈশিষ্ট্য—প্রাথমিক পরিচয়ের প্রতিটি অক্ষ তাই নিক্তি মেপে সমান 'প্রগতিশীল'বা 'প্রতিক্রিয়াশীল'। প্রাথমিক পরিচয়গুলির মধ্যে পড়ে না যে পরিচয়গুলি, সেগুলি মানুষ তার জীবন পরিসরে অর্জন করে। অপরপক্ষে আরও বেশ কিছু পরিচয় কৌমপরিচয় হিসেবে তৈরি করাও হয় ক্ষমতার তরফে। রাষ্ট্র যেমন রাষ্ট্র-পরিচয় তৈরি করে তার নাগরিকদের। যেমন, ভারতীয় বা জাপানি। পরিচয় নির্মাণের—তা সে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই হোক—মূল ব্যাপার থাকে পরিস্থিতিতে বিষয়ীত্ব তৈরি করা।

বিশ্বায়ন-উত্তর সময়ে সারাক্ষণই 'মার্কেট-রিসার্চ' স্টাইলে সমীক্ষা চালানো হয় পেশাদার জনমতসমীক্ষা সংস্থাগুলির তরফে, লোকের এই বিষয়ে কী মত, ওই

বিষয়ে কী মত—তা নিয়ে; এছাড়া আছে সোশ্যাল মিডিয়া; ফলে মানুষের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি রাজনীতির ক্ষেত্রেও নির্ধারক হয়ে উঠছে। বস্তুতঃ বিশ্বায়নোত্তর সময়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র-ও একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের আগের দুনিয়াতে গণতন্ত্র ছিল মানুষের রাজনৈতিক সক্রিয়তার নির্মাণ। সেখানে মানুষ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় না হলে গণ-তে পরিগণিত হত না। এখন দেখা যাচ্ছে, তার সক্রিয়তার চেয়েও বড়ো হয়ে যাচ্ছে তার আপাত নিষ্ক্রিয় মতামত এবং সিদ্ধান্তগুলি। রাজনৈতিক সক্রিয়তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে 'অরাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা'-ও। বিশ্বায়ন-পূর্ব দুনিয়ায় যে জনমত ছিল মিডিয়া হাউজগুলির এডিটরদের ব্যাপার, এখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং জনমতসমীক্ষা সংস্থাগুলির দৌলতে তা অনেক প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান। ফলে পরিচয়ের সহজ আবেদন এই বিশ্বায়নোত্তর রাজনীতির দুনিয়ায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

কিন্তু সর্বমঙ্গলভিত্তিক রাষ্ট্রীয় রাজনীতির আবদ্ধ পরিমণ্ডলে পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির কেবল ও কেবলমাত্র ব্যবহৃত হওয়ার কথা। পরিচয়ের রাজনীতির সামর্থ্য নেই ক্ষমতার রাজনীতি হয়ে ওঠার—যদি না সে ফ্যাসিবাদী হতে পারে, বা প্রায় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র গঠনের ডাক দিতে পারে। ফলে ক্ষমতার রাজনীতি যে পরিচয়ের রাজনীতিকে ব্যবহার করবে তার নিজের প্রয়োজন মতো—এটাই পরিচয়ের রাজনীতির একমাত্র ভবিতব্য। সেদিক থেকে পরিচয়ের রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি নয়। আবার সে সক্ষমতার রাজনীতিও হয়ে উঠতে পারে না পুরোপুরি। কারণ তার শক্তিশালী মনোজাগতিক অস্ত্রগুলির কারণে (বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ঘৃণা) সে বেশ ধারালো ও অতি দ্রুত ক্ষমতার রাজনীতির নেকনজরে পড়ে যায়। ক্ষমতার রাজনীতি হয় তাকে ফ্যাসিবাদী রাজনীতিতে রূপান্তরিত করে অথবা তাকে নিজের রাজনীতির বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করে ছিবড়ে করে ফেলে। যদিও সক্ষমতার রাজনীতির মতোই সে রাষ্ট্রক্ষমতায় তার ছাপ রেখে যায়। পরিচয়ের রাজনীতিকে সক্ষমতার রাজনীতির পরিসরে থাকতে গেলে (অর্থাৎ ক্ষমতার রাজনীতি বা তার বোড়ে না হতে চাইলে) তাকে সচেতন থাকতে হয় আলাদা করে, নিজের রাজনীতির বাইরে থেকে। পরিচয়ের রাজনীতির নিজস্ব বা ভেতরকার ঝোঁক ফ্যাসিবাদের দিকে।

৪

এই সচেতনতা থেকেই প্রয়োজন পড়ে দিশা বা আদর্শের। আমরা মনে করি, সমতার আদর্শ বা দিশাই কেবলমাত্র পরিচয়ের রাজনীতিকে তার ফ্যাসিবাদী ভবিতব্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। অথবা তার ক্ষমতার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার হওয়া (এবং বিনিময়ে ক্ষমতাকে আরো কিছুটা ফ্যাসিবাদী করে তোলা) থেকেও বাঁচাতে পারে। এখানে আমরা ফিরে আসি আগে শেষ না করা একটা কথা-তে।

পরিচয়ের রাজনীতি কেবল সম্ভব তখনই যখন পরিপার্শ্বের দেওয়া পরিচয় এবং আত্মপরিচয় মিলে যায়। যেক্ষেত্রে মেলে না, যেক্ষেত্রে পরিপার্শ্বের দেওয়া পরিচয় নিয়ে নিজের অস্বস্তি থাকে, সেক্ষেত্রে পরিচয়ের রাজনীতি হয় না। যেমন, আমরা যাদের গরীব বলি, তারা কখনওই গরিব পরিচয়ে কোনও পরিচয়ের রাজনীতি করতে পারবে না। শ্রমিক আত্মপরিচয় নিয়েও অনেকের সমস্যা থাকে আজকাল। নারী ও দলিত পরিচয়ের রাজনীতিকে এই বাধার সম্মুখীন হতে হয় নিরন্তর। যাই হোক, সমতার আদর্শ বা দিশা পরিচয়ের রাজনীতিকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে একটা লক্ষ্যে বাঁধে এবং তার ন্যায্যতা এবং অন্যায্যতা নির্ণয় করে। সংক্ষেপে সেটা এরকম—উন্নয়নের নানা ধরনের মাপকাঠিগুলিকে প্রাথমিক পরিচয়গুলি দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় প্রতিটি পরিচয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের মাপ। পরিচয়ভিত্তিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে যারা পিছিয়ে তাদের রাজনীতি ন্যায্য। যারা এগিয়ে তাদের রাজনীতি অন্যায্য। প্রথমটি সমতা। দ্বিতীয়টি তোষণ, ফ্যাসিবাদের বিছন।

তবে সমতার দিশা যে পরিচয়ের রাজনীতিকে শেকল পরায়, তা স্থির-দৃষ্টির পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি। আমরা বলতে বলতে গেছি, যাপনপ্রবাহ নিজেই স্থির-দৃষ্টির পরিচয়কে আলগা করে। মানুষ যাপনের জায়গায় নানা সময় নানা পরিচয়কে প্রাধান্য দেয় পরিস্থিতিতে নিজের বিষয়ীত্ব আনার জন্য। জীবন থেকে বয়ান—সবেতেই যদি যাপনের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হয়, তাহলে আমরা হয়ত পরিচয়কে জীবন প্রক্রিয়ায় বা জীবন প্রবাহে অন্তর্বর্তী মূর্ত দশা হিসেবে দেখতে পারব। তখন হয়ত স্মৃতিকে খুঁড়ে আনা থেকে শুরু করে মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রাধান্যও গৌণ হবে। যাপনের গুরুত্ব শুরু হয় মানুষের প্রতিদিনকার প্রতি সপ্তাহের প্রতি মাসের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর গুরুত্বের মধ্যে দিয়ে। আরও একটা উপায় আছে। নিরন্তর নতুন নতুন আত্মপরিচয়ের গঠন ও বিকাশও পরিচয়ের রাজনীতির গুরুত্ব কমায় বলে আমার মনে হয়।